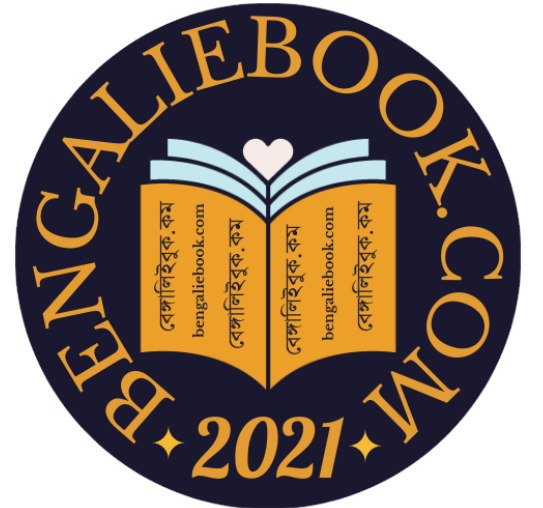


গল্প

ফাঁসি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়



## ফাঁসি

সন্দেহ নাই যে, ব্যাপারটা বড় শোচনীয়। কে কল্পনা করিতে পারিত, বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক শান্ত জীবন যাপন করিবার পর গণপতি শেষপর্যন্ত এমন একটা ভয়ানক ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িবে। শিক্ষিত সদ্বংশের ছেলে, কথায় ব্যবহারে ভদ্র ও নিরীহ, জীবনে ধরিতে গেলে, এক রকম সব দিক দিয়াই সুখী, সে কিনা একটা লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের আসামি হিসাবে ধরা পড়িল! লোকে একেবারে থ বনিয়া গেল। চরিত্রবান সংযত প্রকৃতির ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়া কীভাবে সকলকে এতদিন খুনিটা ঠকাইয়া আসিয়াছিল। কী সাংঘাতিক মানুষ,-এ্যাঁ? জগতে এমন মানুষও থাকে।

গণপতিকে পুলিশে ধরিবার পর ভীত-ব্রিত ও লজ্জায় দুঃখে আধমরা আত্মীয়স্বজনের চেয়ে পরিচিত ও অর্ধপরিচিত অনাত্মীয় মানুষগুলির উত্তেজনাই যেন মনে লাগিল প্রখরতর। বিচারের দিন আদালতে ভিড় যা জমিতে লাগিল বলিবার নয়! টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চে মিথ্যা নাটকের অভিনয় দেখার চেয়ে আদালতে নারীঘটিত খুনি মোকদ্দমার বিচার দেখা যে কত বেশি মুখরোচক, সে শুধু তারাই জানে-রোজ খবরের কাগজে আগের দিনের আইন-আদালতের কার্যকলাপের বিবরণ পড়িয়াও যাদের কৌতূহল মেটে না, বেলা দশটায় খাওয়াদাওয়া সারিয়া উকিল মোক্তারের মতো যারা আদালতে ছুটিয়া যায়।

বাড়িতেই গণপতির তিনজন উকিল। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ এককালে মস্ত উকিল ছিলেন, মাসে একসময় তিনি দশ হাজার টাকাও উপার্জন করিয়াছেন-এখন, সত্তর বৎসর বয়সে আর কোর্টে যান না। বড়ছেলে পশুপতি বছর বার প্র্যাকটিস করিতেছে-বাপের মতো না হোক নামডাক তারও মন্দ নয়। গণপতির ছোটভাই মহীপতিও উকিল, তবে আনকোরা নতুন। বড় উকিলের বড় উকিল বন্ধু থাকে-সমব্যবসায়ী কি না! গণপতির পক্ষ সমর্থনের জন্য অনেকগুলি নামকরা আইনজ্ঞ মানুষ একত্রিত হইলেন, যে তাতেও মামলার গুরুত্ব গুরুতর রকম বাড়িয়া গেল। তবে গণপতিকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো চলিবে কি না সে বিষয়ে

ভরসা করিবার সাহস এঁদের রহিল কম। মুশকিল হইল এই যে, মামলাটা একেবারেই জটিল নয়। মামলা যত জটিল হয়, আইনের বড় বড় মাথাওয়ালা লোক মামলাকে জটিলতর করিয়া খুশিমতো মীমাংসার দিকে ঠেলিয়া দিবার সুযোগ পান তত বেশি।

সহজ সরল ঘটনা। বাহির হইতে ঘরে শিকল তোলা ছিল আর স্বয়ং পুলিশ গিয়া খুলিয়াছিল সে শিকল। ভিতরে ছিল মাত্র রক্তমাখা মৃতদেহটা আর ভয়ে আধপাগলা গণপতি। গোটা দুই টিকটিকি আর কয়েকটা মশা ছাড়া ঘরে আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। মশা অবশ্য মানুষ মারে, মানুষ যত মানুষ মারে তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি, তবু কেন যেন এই খুনের অপরাধটা মশার ঘাড়ে চাপানোর কথাটা গণপতির পক্ষের উকিলেরা একবার ভাবিয়াও দেখিলেন না। তারা শুধু প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, মৃতদেহটা আগেই ঘরের মধ্যে ছিল, পরে গণপতিকে ফাঁকি দিয়া ঘরে ঢুকাইয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হয়।

বড় বিপদ, দয়া করে একবার আসবেন?—এই কথা বলিয়া গণপতিকে ফাঁকি দিয়াছিল একটি লোক, যার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ, পরনে ছিল কোচানো ধুতি, সিক্কের পাঞ্জাবি আর পালিশ করা ডার্বি স্যু। গোপদাড়ি কামানো, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, বিবর্ণ ফরসা রং-লোকটাকে দেখতে নাকি অনেকটা ছিল কলেজের প্রফেসরের মতো! (কলেজের প্রফেসর হইলেই মানুষের চেহারা কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করে কি না গণপতিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে জবাব দিতে পারে নাই, বোকার মতো হাঁ করিয়া বিচারকের দিকে চাহিয়া ছিল।) এই লোকটি ছাড়া আরো তিন জন লোককে গণপতি দেখিতে পাইয়াছিল, বাড়ির সরু লম্বা বারান্দার শেষে। তিনতলার সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে কারা দাঁড়াইয়াছিল। (অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে গণপতি তাদের দেখিতে পাইল কেমন করিয়া?—বিচারক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে গণপতি এতক্ষণ বোকার মতো চুপ করিয়া থাকিয়া এমন জবাব দিয়াছিল যে বিচারক সন্ধিগ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাইয়াছিলেন।)

গণপতি যে কৈফিয়ত দিল, সেটা যে একেবারে অসম্ভব-তা অবশ্য বলা যায় না, অমন কত মজার ব্যাপার এই মজার জগতে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আট-দশ জন

দেশপ্রসিদ্ধ উকিল ব্যারিস্টারের চেষ্ঠাতেও এটা ভালোমতো প্রমাণ করা গেল না। গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল।

ফাঁসি! বিচারক হুকুমটা দিলেন ইংরাজিতে, বাঙলায় যার মোটামুটি চুম্বক এই যে, গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া গণপতিকে যথাবিধি ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, যতক্ষণ সে না মরে। তবে হুকুমটা যদি গণপতির পছন্দ না হয়, সে ইচ্ছা করিলে আপিল করিতে পারে।

বুড়ো রাজেন্দ্রনাথের ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়া গেল। গণপতির বোনেরা ও বৌদিরা যে কান্নার রোল তুলিল-সমস্ত পাড়ার আবহাওয়াটা যেন তাতে বিষণ্ণ হইয়া আসিল। গণপতির বৌ রমার এত ঘন ঘন মূর্ছা হইতে লাগিল যে, তার যে গাল দুটি লজ্জা না পাইলেও সারাক্ষণ গোলাপের মতো আরক্ত দেখাইত, একেবারে কাগজের মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া রহিল। গণপতির বিধবা পিসি ঠাকুরঘরে এত জোরে মাথা খুঁড়িলেন যে, ফাটা কপালের রক্তে চোখের জল তাহার খানিক ধুইয়া গেল।

যথাসময়ে করা হইল আপিল।

অনেক চেষ্ঠা ও অর্থব্যয়ের দ্বারা গণপতির পক্ষে আরো কয়েকটি সাক্ষী এবং প্রমাণও সংগ্রহ করা হইল। তার ফলে, সন্দেহের সুযোগে গণপতি পাইল মুক্তি। যে লোকটিকে খুন করার জন্য গণপতির ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, তাহাকে কে বা কাহারো খুন করিয়াছে-পুলিশ তাহারই খোঁজ করিতে লাগিল।

বাড়ি ফিরিবার অধিকার জুটিল অপরাহে-আকাশ ভরিয়া তখন মেঘ করিয়াছে। অপরাহে খুব ঘটা করিয়া মেঘ করিলে মনে হয় বৈকি যে, এ আর কিছুই নয়, রাত্রিরই বাড়াবাড়ি। গণপতির কান্না আসিতেছিল। আনন্দে নয়, শ্রান্তিতে নয়, বিগলিত মানসিক ভাবপ্রবণতার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকারণে-একটা চিন্তাহীন স্তব্ধ অন্যান্যমনস্কতায়। বন্ধুবান্ধবের হাত এড়াইয়া সে গণপতির সঙ্গে ব্যারিস্টার মিষ্টার দের মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের

কোণে গা এলাইয়া দিয়া পশুপতি ফোঁস করিয়া ফেলিল একটা নিশ্বাস, তারপর নিজেই মিস্টার দেব পকেটে হাত ঢুকাইয়া মোটা একটা সিগার সংগ্রহ করিয়া সাদা ধবধবে দাঁতে কামড়াইয়া ধরিল। মিস্টার দেব একগাল হাসিয়া বলিলেন,-যাক।

কী যে তাহার যাওয়ার অনুমতি পাইল বোঝা গেল না। হয়তো গণপতির দুর্ভোগ, নয়তো অসংখ্য মানুষের পাগলামি-ভরা দিনটা-আর নয়তো পশুপতি যে সিগারটা ধরাইয়াছে-তাই। গণপতি পাংশু মুখ তুলিয়া একবার তাহার পরিতৃপ্ত উদার মুখের দিকে চাহিল, তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল বাহিরের দিকে। একবার এই গাড়িতেই সে মিস্টার দেব সঙ্গে বসিয়া ছিল, কোথায় যাওয়ার জন্য আজ সে কথা ঠিক মনে নাই। গাড়ি ছাড়িবার আগে মিস্টার দেব হঠাৎ হাত বাড়াইয়া ফুটপাথের একটা ভিখারির দিকে একটা আনি ছুড়িয়া দিয়াছিলেন। দানের পুণ্য আলোর মতো সেদিন যেভাবে মিস্টার দেব মুখোনি কে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল আজ জীবনদানের পুণ্য তো তার চেয়ে প্রখর জ্যোতির রূপ লইয়া ফুটিয়া নাই! অবিকল তেমনি মুখভঙ্গি মিস্টার দেব-ভিখারিকে একটা আনি দিয়া তিনি যেমন করেন।

মানুষের অনুভূতির জগতের রীতিই হয়তো এইরকম-মুড়িমুড়িকির এক দর! জীবন ফিরিয়া পাইয়া তার নিজেরও তেমন উল্লাস হইল কই? জীবনের কত অসংখ্য। ছোট ছোট পাওনা তাকে এর চেয়ে শতগুণে উত্তেজিত করিয়াছে, নিবিড় শান্তি দিয়াছে, আনিয়া দিয়াছে দীর্ঘস্থায়ী মনোরম উপভোগ। সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রত্যাশিত অধিকারটা যতভাবে যতদিক দিয়াই, সে কল্পনা করিবার চেষ্টা করুক, জোৎস্নালোকে ছাদে বসিয়া রমার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবার কল্পনা তার চেয়ে কত ব্যাপক, কত গাঢ়তর রসে রসালো!

দু-ভাইকে বাড়ির দরজায় নামাইয়া দিয়া মিস্টার দেব চলিয়া গেলেন। তখন বাম বাম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বাড়ির সকলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; বৃষ্টি না নামিলে হয়তো প্রতিবেশীরাও অনেকে আসিত। গণপতি নামিয়া প্রথমে রাজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিবে, পিসিমা তাই সে-পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। গণপতির প্রণাম শেষ

হইতেই তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হু হু করিয়া উঠিলেন কাঁদিয়া। এ কান্না অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়, সকলেই জানিত পিসিমা এমনভাবে কাঁদিবেন। তাই খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহাকে কাঁদিতে দিল। গণপতির কেমন একটা অস্বাভাবিক লজ্জা বোধ হইতেছিল। বাড়ি আসিবার জন্য মিষ্টার দের গাড়িতে উঠিয়া কাঁদিবার যে জোরালো ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, হঠাৎ কখন তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে। নিজেকে লুকাইতে পারিলে এখন যেন সে বাঁচিয়া যায়। নিজের বাড়িতে আপনার জনের আবেষ্টনীর মধ্যে ক্রন্দনশীল পিসিমার বক্ষলগ্ন হইয়া থাকিবার সময় জেলখানায় তাহার সেই নিভৃত সেলটির জন্য গণপতির সমস্ত মনটা লোলুপ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, আর কিছুক্ষণ এমনভাবে কাটিলে তার মাথার মধ্যে একটা কিছু ছিঁড়িয়া যাইবে।

আর কেহ কাঁদিতেছে না দেখিয়া পিসিমা একটু পরে আত্মসংবরণ করিলেন। তখন গণপতির স্ত্রী পরিমল বলিল, কী চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো!

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, আর চেহারা...?

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কী করিবে-এই কথাটাই গণপতি এমনভাবে বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বৌদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারি রুঢ় একটা দ্রুত করিয়াছে। গণপতিও হঠাৎ তাহা খেয়াল করিয়া মনে মনে অবাক হইয়া গেল! এমন শোনাইল কেন কথাটা? রোগ হইয়া যার জীবন যাইতে বসে, সে ভালো হইয়া উঠিলে এমনভাবে যখন কেহ তাহার চেহারা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন অবিকল এমনভাবেই তো জবাব দিতে হয়! চেহারা কেন খারাপ হইয়াছে, উভয় পক্ষেরই যখন তাহা জানা থাকে, চেহারা সম্বন্ধে এই তো তখন বলাবলির রীতি। অথচ আজ এই কথোপকথন তার এতগুলি আপনার জনের কানে গিয়া আঘাত করিয়াছে।

কারণটা গণপতি যেন বুঝিতে পারিল, রোগে যে রোগা হয়, চেহারা খারাপ হওয়ার অধিকার তাহার আছে, সেটা তার দোষ নয়। কিন্তু খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া

আসিবার অধিকার এ জগতে কারো তো নাই-সে তো পাপের ফল,-অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া। তার দুর্বল দেহ ও পাংশু মুখ যে শুধু এই কথাটাই ঘোষণা করিতেছে, অতি লজ্জাকর একটা খুনের দায়ে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল।

মাথাটা ঘুরিতেছিল, গণপতি একবার বিহুলের মতো সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণে তাহার চোখ পড়িল রমার দিকে। আর সকলে তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমা কিন্তু কাছে আসে নাই, পাশের লাইব্রেরিঘরে ঢুকিবার দরজাটার আড়ালে সে পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হইয়া আছে, অনেক দূরে... দীর্ঘ ব্যবধানে। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ব্যবধানটা যেন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তারপর লুপ্ত হইয়া গেল অন্ধকারে।

বাড়ি ফিরিয়া পরিমলের সঙ্গে একটা কথা বলিয়াই গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল- এতে কারো অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। আহা! প্রায় ছমাস ধরিয়া বেচারা কি কম সহ্য করিয়াছে! কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে নিজের জীবন লইয়া ভাগ্যের লটারি খেলার অনিশ্চিত ফলাফলের প্রতীক্ষায় একাকী দিন কাটানো তো শুধু নয়,-বাহিরের অদৃশ্য জগতের কাছে ঘাড়-মোচড়ানো অফুরন্ত কাল্পনিক লজ্জা ভোগ করাও তো শুধু নয়, গণপতি যে অনেকগুলি দিন ধরিয়া ফাঁসির দিনও গুণিয়াছে। ফাঁসি! ভাবিতে গেলেও নিরাপদ সহজ মানুষের দম আটকাইয়া আসে না? মূর্ছিত হইয়া পড়িবে বৈকি গণপতি! অনেক আগেই তার দুবার মূর্ছা যাওয়া উচিত ছিল। একবার যখন সে নিজের ফাঁসির হুকুম শোনে-আর যখন সে জানিতে পারে, এ জীবনের মতো ফাঁসিটা তাহার বাতিল হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্যরকম শক্ত মানুষ বলিয়াই না মূর্ছটা সে এতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল।

সহ্যশক্তি রমারও কম নয়। আজ কতকাল সে খুনি-আসামির বৌ হইয়া বাঁচিয়া আছে- অপাপবিদ্ধ পবিত্র মানুষের ঘরকন্নার মধ্যে পাড়ার একপাল ভদ্রমহিলার কৌতুক ও

কৌতূহল-মেশানো সহানুভূতির আকর্ষণে আবর্তে। কতদিন ধরিয়া সে অহোরাত্রি যাপন করিয়াছে-স্বামীর আগামী ফাঁসির তারিখের বৈধব্যকে ক্রমাগত বরণ করিয়া করিয়া! আপিল যদি না করা হইত-আজ রাত্রি প্রভাত হইলে কারো সাধ্য ছিল না রমাকে বৌ করিয়া রাখে। তবু এখনো লাইব্রেরিঘরে ঢুকিবার দরজার আড়ালে পাষাণপ্রতিমার মতো তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গি দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। না আছে চোখে ভয়, না আছে দেহে শিহরণ। পাষাণপ্রতিমার মতোই। তার কাঠিন্য যেন অকৃত্রিম। গণপতি যে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, তাতেও যেন তার। কিছু আসিয়া গেল না। এক পা আগানো দূরে থাক, এক পা পিছাইয়া লাইব্রেরিঘরের ভিতরে আত্মগোপন করাটাই সে যেন ভালো মনে করিল। স্বামীর,-সত্যবানের মতোই যে স্বামী তাহার-মৃত্যুর কবল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর মূর্ছা ভাঙিবার কী আয়োজন হইল, একবার তাহা চাহিয়া দেখিবার শখটাও অন্ততপক্ষে রমার গেল কোথায়? এ কৌতূহল যে-মেয়েমানুষ দমন করিতে পারে-ধরিত্রীর মতো তার সহ্যশক্তিও সত্যিই অতুলনীয়-মৃত ও অসাড়!

মাথায় জল দিতে দিতে অল্পক্ষণ পরেই গণপতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। জামাকাপড় বদলাইয়া এক বাটি গরম দুধ খাইয়া সে সকলের সঙ্গে ভিতরের বড় ঘরে গিয়া বসিল। পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া। বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজি হইল না। মূর্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কী কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে। অনেক জল ঢালবার ফলে মাথাটা বোধ হয় তাহার ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল, সকলের সঙ্গে কথা বলিবার জন্য এতক্ষণে সে একটু একটু আগ্রহই বরণ বোধ করিতে লাগিল।

অল্পে অল্পে একথা-সেকথা হইতে কথাবার্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছ-মাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘূর্ণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিন মাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ির যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়াছিল, আজ পিসিমার মুখে সেই ঘটনার কথা শুনিয়া সে

নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমনকি-যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল-পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতোছে এমনভাবে শুনিয়া গেল। স্মৃতি, চিন্তা, অনুভূতি, কল্পনা প্রভৃতি গণপতির ভিতরে কমবেশি জড়াইয়া গিয়াছে সত্য, তবু জানা কথা ভুলিবার মতো অন্যমনস্কতা তো ফাঁসির আসামিরও আসিবার কথা নয়! কিন্তু এই অভিনয়ই গণপতির ভালো লাগিতেছিল। এমনই উৎসুকভাবে একথা-সেকথা জানিতে চাহিলে এবং তার জবাবে যে যাই বলুক গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাই শুনিয়া গেলে, ক্রমে ক্রমে তার নিজের ও অন্যান্য সকলেরই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে দীর্ঘকালের জন্য সে দূরদেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। এতদিন তার গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার আসল কারণটা সকলে ভুলিয়া যাইবে।

হয়তো তাই যাইতে লাগিল এবং সেইজন্য হয়তো যখন আবার ওই আসল কারণটা মনে পড়িবার অনিবার্য কারণ ঘটিতে লাগিল, সকলেই যেন তখন হঠাৎ একটু একটু চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। গণপতিকে পুলিশে ধরিবার অল্প কিছুদিন আগে মহাসমারোহে তার ছোটবোন রেণুর বিবাহ হইয়াছিল। গণপতি একসময় রেণুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে সকলের এমনি সচকিতভাব দেখা গেল। এ ওর মুখের দিকে চাহিল-কিন্তু বয়স্ক কেহ জবাব দিল না। শুধু গণপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসিমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।

গণপতি অবাক হইয়া বলিল, মারে?

মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কিনা তাই জন্য।

তিন-চার জন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। মনে হইল, ধমকটা যেন গণপতিকেই দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মায়ার চেয়েও তার মুখখানা শুকাইয়া গেল বেশি। আবার কিছুক্ষণ এখন তাহার কারো মুখের দিকে চোখ তুলিয়া, চাহিবার ক্ষমতা হইবে না।

পশুপতি গলা সাফ করিল। বলিল, ঠিক যে মারে তা নয়, তবে ওরা ব্যবহারটা ভালো করছে না।

বড় বোন বেণু বলিল, বিয়ের পর সেই যে নিয়ে গেল মেয়েটাকে এ পর্যন্ত আর একবারও পাঠায়নি। মহী দু-বার আনতে গেল।

মহীপতি বলিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেও দেয় নি। বললে—

রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, আহা, থাক না ওসব কথা, বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতে ওকে ওসব শোনার দরকার কী! ও তো আর পালিয়ে যাবে না।

খানিকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিল। বাহিরে বাদল মাঝখানে একটু কমিয়াছিল, এখন আবার আরো জোরের সঙ্গে বর্ষণ শুরু হইয়াছে। ঘরের মধ্যে এখন ভিজা বাতাসের গাঢ়তম স্পর্শ মেলে। রমা এবারও ঘরে আসে নাই, এবারও সে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—পাশের ঘরের দরজার ওদিকে। তবে এবার আর সে দাঁড়াইয়া নাই, মেঝেতে বসিয়াছে। একতলার রান্নাঘর হইতে ডালসস্তারের গন্ধ ভিজা বাতাসকে আশ্রয় করিয়া আসিয়া এ ঘরে জমা হইয়াছে, বেণুর বড় মেয়ে শৌখিন সুহাসের অঙ্গ হইতে এসেসের যে গন্ধ এতক্ষণ পাওয়া যাইতেছিল তাও গিয়াছে ঢাকিয়া। পিসিমা কয়েক মিনিটের জন্য ঠাকুরঘরে গিয়াছিলেন, প্রসাদ ও প্রসাদি ফুলের রেকাবি হাতে তিনি এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আগে গণপতিকে বলিলেন, জুতো থেকে পা-টা খোল তো বাবা।

জুতার স্পর্শ ত্যাগ করিয়া গণপতি পবিত্র হইলে, পিসিমা প্রসাদি ফুল লইয়া তাহার কপালে ঠেকাইলেন, তারপর হাতে দিলেন প্রসাদ এবং আজও আধা-মমতা আধা-ধমকের সুরে তাহার চিরন্তন অনুযোগটা শুনাইয়া দিলেন—ঠাকুরদেবতা কিছু তো মানবিনে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।

এ ঘরে কেহ কিছু বলিল না; কিন্তু পাশের ঘরের দরজার ওদিক হইতে অস্ফুট কণ্ঠে শোনা গেল, মাগো।

পিসিমা চমকাইয়া বলিলেন, কে গো ওখানে বৌমা?

পরিমল জিজ্ঞাসা করিল, কী হল রে রমা?

রমার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিমলের কোলের ছেলেটি মেঝেতে হামা দিতে দিতে নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, গণপতি হাত বাড়াইয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল-ওকে আদর করিবার ছলে মাথা হেঁট করিয়া থাকা সহজ। রাজেন্দ্রনাথ কাঁপা গলায় বলিলেন, দ্যাখ তো সুহাস, মেজ-বৌমার কী হল? ফিট-টিট হল নাকি?

পরিমল বলিল, তুই বোস, আমি দেখছি।

উঠিয়া গিয়া নিচুগলায় রমাকে কী যেন জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল; বলিল, না, কিছু হয় নি।

কিছু না। একেবারেই কিছু হয় নাই। কী হইবে ওই পাথরের মতো শক্ত মেয়েমানুষটার? এই যে এতকাল গণপতি জেলখানায় আটক ছিল, ফাঁসি এড়ানোর ভরসা কয়েকদিন আগেও তাহার ছিল না, রমা কি একদিন আবেগে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ননদ, জা কারো বুকে একবার আশ্রয় খুঁজিয়াছিল, কারোকে টের পাইতে দিয়াছিল-তার কিছুমাত্র সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে? এ কথা সত্য যে, যেদিন হইতে গণপতিকে পুলিশে ধরিয়াছিল, সেদিন হইতে সে হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দিনের পর দিন কথা কমাইয়া কমাইয়া প্রায় বোবা হইয়া গিয়াছে, রোগা হইতে হইতে সোনার বরন তাহার হইয়া গিয়াছে কালি। তা, সেটা আর এমন কী বেশি! দুঃখের ভাগ তো সে দেয় নাই, সান্ত্বনা তো নেয় নাই, লুটাইয়া বুকফাটা কান্না তো কাঁদে নাই।

একদিন বুঝি কাঁদিয়াছিল। শুধু একদিন!

গভীর রাত্রে বাড়ির সকলে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে-সুহাস ছাড়া। সেদিন সুহাসের বর আসিয়াছিল, তাই বর-বৌ দুজনেরই হইয়াছিল অনিদ্রা-রোগ। অত রাত্রে ঘর ছাড়িয়া

বাহির হইয়া দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া রমার ঘরের সামনে দিয়া তাদের কোথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল-সে কথা বলা মিছে। নিজের ঘরে রমা একা থাকিত, এখনো তাই থাকে। অনেক বলিয়া অনেক বকিয়াও তাকে কারো সঙ্গে গুইতে রাজি করা যায় নাই। এমনকি শ্বশুরের অনুরোধেও না।

যাই হোক, রমার ঘরের সামনে সুহাস থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে বিশ্রী একটা গোঙানির আওয়াজ শুনিয়া ভয়ে বেচারির স্বামী সোহাগে তাতানো দেহটা হইয়া গিয়াছিল হিম। বরকে ঘরে পাঠাইয়া, তারপর সে ডাকিয়া তুলিয়াছিল পরিমলকে; বলিয়াছিল, বড়মামি, ঘরের মধ্যে মেজমামি গোঙাচ্ছে, শিগগির এসো।

গোঙাচ্ছে? ডাক ডাক তোর মামাকে ডেকে তোল, সুহাস!-কী হবে মা গো!

পশুপতিকে পিছনে করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পরিমল খানিকক্ষণ রুদ্ধ দরজায় কান পাতিয়া রমার গোঙানি শুনিয়াছিল। তারপর জোরে জোরে দরজা ঠেলিয়া ডাকিয়াছিল, মেজ-বৌ! ও মেজবৌ, শিগগির দরজা খোল।

প্রথম ডাকেই গোঙানি থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তারপর অনেক ডাকাডাকিতেও রমা প্রথমে সাড়া দেয় নাই। শেষে ধরা গলায় বলিয়াছিল, কে?

আমি। দরজা খোল তো মেজ-বৌ, শিগগির।

কেন দিদি?

পরিমল অবশ্য সে কৈফিয়ত দেয় নাই, আরো জোরে ধমক দিয়া আবার দরজাই খুলিতে বলিয়াছিল। রমারও আর দরজা না খুলিয়া উপায় থাকে নাই।

কী হয়েছে দিদি?

তুই গোঙাচ্ছিলি কেন রে, মেজ-বৌ? রমা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিয়াছিল, গোঙাচ্ছিলাম? কে বললে?

বারান্দার আলোয় রমার মুখে চোখের জলের দাগগুলি স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল। একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া পরিমল বলিয়াছিল-আমি নিজে শুনেছি, তুই তবে কাঁদছিলি?

না, কাঁদি নি তো! কে বললে কাঁদছিলাম?-বলিয়া পশুপতির দিকে নজর পড়ায় রমা লম্বা ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল।

তখন পরিমল বলিয়াছিল, আমি আজ তোর ঘরে শোব রমা?

রমা বলিয়াছিল, কেন?

কী কৈফিয়তই যে মেয়েটা দাবি করিতে জানে! অফুরন্ত!

পরিমল ইতস্তত করিয়া বলিয়াছিল, ভয়টয় যদি পাস—

রমা বলিয়াছিল, ভয় পাব কেন? আমার অত ভয় নেই... বড্ড ঘুম পাচ্ছে দিদি।

বলিয়া সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কী রুঢ় ব্যবহার! মনে। করলে আজও পরিমলের গা জ্বালা করে।

যাই হোক, তার পর হইতে রাত্রে বাহিরে গেলে বাড়ির অনেকেই চুপিচুপি রমার ঘরের দরজায় কান পাতিয়া ভিতরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আর কোনোদিন কিছু শোনা যায় নাই।

শোনা যাইবে কী, রমা কি সহজ মেয়ে! হোক না স্বামীর ফাঁসি, সে দিব্যি মস্ত একটা ঘরে সারারাত একা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে পারে। আজ হঠাৎ অস্ফুট স্বরে একবার মাগো বলিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই ওর যে কিছু হইয়াছে-এ কথা মনে। করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

মিস্টার দেব কড়া সিগার টানিয়া পশুপতির বোধ হয় গলাটা খুসখুস করিতেছিল, সে আর একবার গলা সাফ করিয়া বলিল, রেণুর জন্য তুমি ভেবো না গনু। ওকে আসতে দেয় নি বটে, কিন্তু ওকে কষ্ট ওরা দেয় না।

বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়া আর আসিতে না দিলে, মোল বছরের মেয়েকে কষ্ট দেওয়া হয় কি না, গণপতি ধারণা করিয়া উঠিতে পারিল না; কিন্তু বোনটার জন্য তার নিজের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, ওকে একটা তার করে দিলে হত না?

পশুপতি বলিল, তোমার কথা? থাকগে, কাজ নেই, কী আর হবে ওতে? মাঝখান থেকে বাড়ির লোকে হয়তো অসম্ভব হবে। কাল খবরের কাগজেই সব। পড়তে পারবে।

খবরের কাগজ? তা ঠিক, খবরের কাগজে কাল সব খবরই বাহির হইবে বটে। কিন্তু রেণু কি খবরের কাগজ পড়িতে পায়? ভাই খুনের দায়ে ধরা পড়িয়াছে বলিয়া অতটুকু মেয়েকে যারা আটক করিয়া রাখিতে পারে-এতখানি উদার কি তাদের হওয়া সম্ভব? গণপতি পরিমলের ছেলেকে মেঝেতে নামাইয়া দিয়া বলিল, তবু আপিলের ফলটা আগে থাকতে জানতে পারলে-

রাজেন্দ্র বলিলেন, তাই বরং দাও পশু, রেণুর শ্বশুরকে একটা তার করে দাও। লিখে দিও প্লিজ ইনফর্ম রেণু-নয়তো সে ব্যাটা হয়তো মেয়েটাকে কিছু জানাবে না।

তার লিখিতে পশুপতি আপিসঘরে গেল।

.

মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে সব সময়ে মানুষকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পাশবিকতা দিয়া হোক, দেবত্ব দিয়া হোক, কে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? বত্রিশ বছর যে পরিবারে গণপতি সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করিয়াছে, আজ সেখানে একটা বীভৎস অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে যে বিশেষভাবে অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠবে

এবং এতগুলি মানুষের মধ্যে ক্রমাগত মানুষকে খুঁজিয়া পাইতে থাকিবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পলকে পলকে সে টের পাইতে লাগিল, এরা ভুলিতে পারিতেছে না। বিচার নয় বিশ্লেষণ নয়, বিরাগ অথবা ক্ষুধাও নয়, শুধু স্মরণ করিয়া রাখা-স্মরণ করিয়া রাখা যে, তাদের এই গণপতির অকথ্য কলঙ্ক রটিয়াছে, দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালোরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারে এইখানে শেষ নয়, এখনো অনেক বাকি, অনেক মন ও মানের লড়াই। প্রত্যেকের ভিতরের মানুষটি এই অনিবার্য ক্ষতি ও বিপদের চিন্তায় ভীত ও বিমর্ষ হইয়া আছে, এই যে মানুষ, ভিতরের মানুষ, এ বড় দুর্বল, বড় স্বার্থপরতাই এ কথাটাও কে না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়াছে যে, এর চেয়ে ফাঁসি হইয়া গেলেই অনেক সহজে সব চুকিয়া যাইতে পারিত। যে নাই, কতকাল কে তার কলঙ্ককাহিনী মনে করিয়া রাখে? মনে করিয়া রাখিলেই বা কী? গণপতি না থাকিলে, এ বাড়িতে কেন তার কলঙ্কের ছায়াপাত হইবে? সেটা নিয়ম নয়। লোকে শুধু এই পর্যন্ত ভাবিতে পারিত যে, এ বাড়িতে একটা বদলোক থাকিত, যে একটা স্ত্রীলোকঘটিত অপরাধে জড়িত হইয়া একটা মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়াছিল-কিন্তু সে লোকটা এখন আর নাই, এই বাড়ির আবহাওয়া এখন আবার পবিত্র, এ বাড়ির মানুষগুলি ভালো।

আর তা হইবার নয়! দুষ্ট মানুষ ঘরে আসিয়াছে, তার দোষে ঘরের আবহাওয়া দূষিত হইয়াছে, দূষিত আবহাওয়া মানবগুলিকে করিয়াছে মন্দ! অন্তত লোকে তো তা-ই ভাবিবে।

এত স্পষ্টভাবে না হোক, মোটামুটি এই চিন্তাগুলিই গণপতির অনুসন্ধান তার মনে আনিয়া দিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সহসা রমার জন্য তার মনে দেখা দিল গভীর মমতা! জেলে বসিয়া রমার কথা ভাবিয়া তার খুব কষ্ট হইত, কিন্তু সে ছিল। শুধু তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া-রমা যে যাতনা ভোগ করিতেছে, তাই ভাবার কষ্ট। কিন্তু এখন হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল, স্বামীর জন্য শুধু ভাবিয়াই রমা রেহাই পায় নাই, নিজের অন্ধকার

ভবিষ্যতটার পীড়ন সহিয়াই তার মহাশক্তির পরীক্ষা শেষ হয় নাই, আরো অনেক কিছু জুটিয়াছে। বাহিরের জগৎ নরঘাতকের স্ত্রীকে যা দেয় সে সব যে কী এবং সে সব সহ্য করিতে একটি নিরুপায় ভীরা বধূর যে কতখানি কষ্ট হইতে পারে-ধারণা করিবার মতো কল্পনাশক্তি গণপতির ছিল না। যেটুকু সে অনুমান করিতে পারিল তাতেই বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, যাক, রমার একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা তো দূর হইয়াছে! স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়া আজ তো মনে তার আনন্দের বান ডাকিয়াছে। এতদিন সে যদি অকথ্য দুঃখ পাইয়াই থাকে আজ আর সেকথা ভাবিয়া লাভ কী? প্রতিকারের উপায়ও তাহার হাতে ছিল না যে, রমার দুঃখ কমানোর চেষ্টা করার জন্য আজ আফসোস করিলে চলিবে। জেলে বসিয়া রমার দুঃখটা সে ঠিকমতো পরিমাপ করিতে পারে নাই; অন্যায় যদি কিছু হইয়া থাকে তা শুধু এই। তা এ অন্যায়ের জন্য রমার আর কী আসিয়া গিয়াছে। সে বুঝিলেই তো রমার দুঃখ কমিত না।

রাত্রি দুটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু-একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু-চার জন বন্ধুবান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারো সঙ্গে দেখা না করে-সে-ই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ, সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি এ কথা কানে তুলিল না, নিচে গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ করিল। রমার কথা নূতনভাবে ভাবিতে আরম্ভ করিবার পর গণপতি নিজের মধ্যে একটা নূতন তেজের আবির্ভাব অনুভব করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, যা-ই ঘটিয়া থাক, ভীরা ও দুর্বলের মতো হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না; নিজের জোরে আবার তাহাকে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভূমিকম্পে বাড়ি অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে বলিয়া মাঠে বাস করিলে তো তাহার চলিবে না? বাড়িটা আবার মেরামত করিয়া লইতে হইবে। লজ্জায় সে যদি এখন মুখ লুকায়, তার লজ্জার কারণটা যে লোকে আরো বেশি সত্য বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিবে, আরো বড় বলিয়া ভাবিতে থাকিবে।

যাঁরা আসিয়াছিলেন, গণপতির মুক্তিতে আনন্দ জানানোর ছলে কৌতূহল মিটাইতেই তাদের আগমন। গণপতির সঙ্গে কথা বলিয়া সকলে একটু অবাক হইয়াই বাড়ি গেলেন। মানুষটা ভাঙিয়া-চুরিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব যে নীচে নামিয়াছে-কারো তা মনে হইল না। সে নিজেই একরকম চেষ্টা করিয়া প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা কাটাইয়া আনিল। বেশি বকিল না, বেশি গম্ভীর হইয়া থাকিল না, গোঁয়ারের মতো ফাঁসির হুকুম পাওয়ার ব্যাপারটাকে অবহেলা করিয়া একেবারে উড়াইয়াও দিল না, আবার এমন ভাবও দেখাইল না যে, ফাঁসির হাত এড়ানোর আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান তো আছেন, বিনা দোষে একজনকে তিনি কি শাস্তি দিতে পারেন? এমন আশ্চর্য সরলতার সঙ্গে এমনভাবে গণপতি একবার এই কথাগুলি বলিল যে, শ্রোতাদের মনে তার প্রতি সত্য সত্যই একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা দিল, মনে হইল-আসিবার সময় লোকটার সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁদের ছিল, লোকটা হয়তো সত্যই অতটা খারাপ নয়।

আগন্তুকদের মধ্যে এই পরিবর্তনটুকু টের পাইতে গণপতির বাকি রহিল না। জয়ের গর্বে ও আশার আনন্দে তার বুক ভরিয়া গেল। এবার তাহার বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, সে পারিবে, তার ভাঙা মানসম্রমকে আবার সে নিটোল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তার নামে চারিদিকে যে টিটি শব্দ পড়িয়া গিয়াছে-ক্রমে ক্রমে একদিন সে শব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া একেবারে মিলাইয়া যাইবে। তার সম্বন্ধে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব মরিয়া গিয়া মানুষের মনে আবার জাগিয়া উঠিবে প্রীতি ও শ্রদ্ধা-মানুষের মাঝখানে মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকিতে আর তার কোনো অসুবিধা থাকিবে না।

রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছিল, বাহিরের সকলে চলিয়া গেল, গণপতি আর বেশি দেরি না করিয়া সামান্য কিছু খাইয়া নিজের ঘরে শুইতে গেল। নবজীবনের সূচনা করিতে বাহিরের কয়েকটি লোকের কাছে খানিক আগে সে যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তখনো তার মন হইতে তার মাদকতাভরা মোহ কাটিয়া যায় নাই এবং খানিক পরে সেই জন্যই রমার সঙ্গে তার বাধিল বিবাদ।

বিবাদ? এমন প্রত্যাবর্তনের পর রমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার রাত্রে-বিবাদ? হয়তো ঠিক তা নয়; কিন্তু রমা ঘরে আসিবার ঘণ্টাখানেক পরে দুজনের মধ্যে যেসব কথার আদান-প্রদান হইল, সেগুলি বিবাদের মতোই একটা কিছু হইবে।

আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার সাহস দুজনের কাহারো ছিল না। ঘরে ঢুকিয়া রমা তাই যেমন ধীরপদে তার কাছে আসিল, সে-ও তেমনি ধীরভাবেই তাহাকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিল। রমার ওজন অর্ধেক হালকা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গণপতি সেটা ভালোরকম টের পাইল না। তার গায়ের জোরও যে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে!

রমার দুচোখ দিয়া আস্তে আস্তে জলের ফোঁটা নামিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, তোমায় ফিরে পাব ভাবিনি।

গণপতি তার মাথাটা কাঁধের পাশে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ভাবিনি আবার এ ঘরে তোমার কাছে ফিরে আসতে পাব।

শুধু রমার কাছে নয়, এ ঘরে রমার কাছে ফিরিয়া আসিবার সাধ! রমাকে দেখিবার ফাঁকে ফাঁকে এখনো গণপতি ঘরখানাকেও দেখিতেছিল। প্রায় কিছুই বদলায় নাই ঘরের। বাগানের দিকে দুটি জানালার কাছে, যেখানে যেভাবে খাট পাতা ছিল আজও সেইখানে তেমনিভাবে পাতা আছে। ও-কোণে দেওয়ালে বসানো আলোটার ঠিক নিচে রমার প্রসাধনের টেবিল, ছমাস কি সে প্রসাধন করিয়াছিল? এখানে খাটে বসিয়া আজও আয়নাটাতে তাদের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে : রমা আগে মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, ওরা কে গো? আমাদের দেখছে না তো? দেওয়ালে তাদের বিবাহের বেশে তোলা ফটো এবং এ বাড়ির ও রমার বাড়ির কয়েকজনের ফটো টাঙানো আছে। কেবল পুরনো যে তিনটি দামি ক্যালেভার ছিল তার একটির বদলে আসিয়াছে দুটি সাধারণ ছবিওয়ালা ক্যালেভার। তার অনুপস্থিতির সময়ের মধ্যে একটা বছর কাবার হইয়া গিয়া নতুন একটা বছর যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আরো একটা পরিবর্তন হইয়াছে ঘরের। ঘরের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। মেঝেটা সেরকম ঝকঝকে নয়, ফটো আর

ছবিগুলোতে অল্প অল্প ধূলা আর ঝুল পড়িয়াছে, চারিদিকে আরো যেন আসিয়া জুটিয়াছে কত অদৃশ্য মলিনতা।

কী দেখছ?-রমা একসময় জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে।

গণপতি বলিল, ঘর দেখছি।

রমা বলিল, ঘর দেখে আর কী হবে? এ ঘরে তো আমরা থাকব না।

থাকব না? কোন ঘরে যাব তবে?

আমরা চলে যাব।

রমা বিছানায় নামিয়া একটু সরিয়া ভালো করিয়া বসিল! বিবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। গণপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথা চলে যাব রমা?...

অনেক বিনিদ্র রাত্রি ব্যাপিয়া রমা এ প্রশ্নের জবাব ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, যেরদিকে দুচোখ যায় অনেক দূর অচেনা দেশে, কেউ যেখানে আমাদের চেনে না, নামধাম জানে না-সেখানে গিয়ে আমরা বাসা বাঁধব। আজ রাত্রেই সব বেঁধে-হেঁদে রাখি, কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ব, কেমন? আর একটা দিনও আমি এখানে থাকতে পারব না।

গণপতি বোকার মতো জিজ্ঞাসা করিল, কেন?...

রমা স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝতে পারছ না? সবাই আমাদের ঘেন্না করবে, আমরা এখানে থাকব কী করে?

এমনিভাবে শুরু হইল তাহাদের কথা-কাটাকাটি। গণপতি বলিল যে, এমন পাগলের মতো কি কথা বলিতে আছে, বাড়ি-ঘর আত্মীয়স্বজন অর্থোপার্জন সব ফেলিয়া গেলেই কি চলে? কী-ই বা দরকার যাওয়ার? দু-চার দিন লোকে হয়তো একটু কেমন কেমন

ব্যবহার করিতে পারে, তারপর সব ঠিক হইয়া যাইবে। এত ভাবিতেছে কেন রমা? বিবাদ করার মতো করিয়া নয়, আদর করিয়া-খুব মিষ্টি ভাষাতেই গণপতি তাহাকে কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাহিরের ঘরে, বাহিরের কয়েকটি লোকের মন হইতে অন্ধকার ভাব সে যে মোটে আধঘণ্টার চেষ্টাতে প্রায় দূর করিয়া দিয়াছিল, এ কথা গণপতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া চিরদিনের জন্য বহুদূরদেশে-অজানা লোকের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার ইচ্ছাটা রমার, তাই তার মনে হইতেছিল ছেলেমানুষি।

রমা শেষে হতাশ হইয়া বলিল, যাবে না?

গণপতি তাহাকে বুকে টানিয়া আনিল, সম্মুখে তাহার পাংশু কপোলে চুম্বন করিয়া বলিল, যাব না বলেছি, পাগলী? চলো না দু-জনে দু-চার মাসের জন্য কোথা থেকে বেড়িয়ে আসি।

রমা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, দু-চার মাসের জন্য আমি কোথাও যাব না। চিরদিনের জন্য।

আচ্ছা, কাল এসব কথা হবে রমা।

না, আজকে বলো যাবে কিনা, এখনি বলো। কাল ভোরে উঠে আমরা চলে যাব।

গণপতি এবার হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? এমন করে কেউ কখনো যায়?

রমা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা, তবে থাকো।

গণপতি আরো খানিকক্ষণ তাহাকে আদর করিল, আরো খানিকক্ষণ বুঝাইল। কিন্তু দুর্বল শরীরটা তাহার শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাই আধঘণ্টাখানেক পরে ছেলেমানুষ বৌকে আদর করা ও বোঝানো দুটাই যথেষ্ট হইয়াছে, মনে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে রাজেন্দ্র উকিলের বাড়িতে একটা বিরাট হইচই শোনা গেল। বাড়ির মেজ-বৌ রমা নাকি গলায় ফাঁসি দিয়া মরিয়াছে।